Research Article

প্রতিধ্বনি the Echo

A journal of Humanities & Social Science

Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: www.thecho.in

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী সাহিত্য পাঠ বিশ্লেষণঃ প্রেক্ষিত মনসামঙ্গল কাব্য

অরূপা চক্রবর্তী

গবেষক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

Through the application of the Dialectical materialism of Karl Marx's, the essence of Dialectical materialism is created in literature. From this doctrine, it can be understood that the writers have sympathetic attitude towards the distressed and marginalized people of the society. Marxism is the essence of the struggle to free people against exploitation and torture. Feudalism is divided into two classes-one is exploited class, the other exploiting class or the owner of the extender. The key word of Marx's dialectical materialism is to build a society free from exploitation, through comprehensive range of absorption and class struggle.

If we discuss the ***Manasamangala*** *epic in the context of dialectical materialism, it is easily seen that the effort of Manasa to be worshipped by the feudal lord Cad was actually a fight for establishing marginalised people in the society. If we discuss it from another angle, it is noticed that Manasa being a daughter of feudal lord Mahadev exploited the human being Cad and in this way it expresses the cheap aggressive attitude of rulers. In the conflict between Manasa of Cad, Behula became victimized who has been utilized by Manasa for her own interest and these sufferings of Behula compelled her to take step against Manasa. In this epic Neta, the follower of Manasa showed the tactical intelligence of the political leaders.*

সাহিত্য বিষয়ে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ভাবনাচিন্তার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। শিল্প সাহিত্য বিষয়ে মার্কস অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় কম লিখেছেন। কিন্তু মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে বিভিন্ন দিকে প্রয়োগের পরিণতিতে বাস্তব মনস্তত্ত্বের যে সব অনাবিস্কৃত মাত্রাগুলি নানা সময়ে নানাভাবে উন্মোচিত হয়েছে, সে সবের প্রভাবে শিল্প ও সাহিত্যের জগতে বিচিত্রমুখী সমালোচনা ধারার সূচনা ঘটেছে। সমাজ বিবর্তনের দ্বান্দ্বিক নিয়মেই ক্রমশ আবির্ভাব ঘটেছে শোষণ ভিত্তিক সমাজের। ফলত সমাজ বিভক্ত হয়ে গেছে দুটি স্পষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীতে। যার একদিকে রয়েছে অযুত শোষিত মানুষ, অন্যদিকে অস্ত্র-শস্ত্র ও শক্তির বলে বলীয়ান স্বল্প সংখ্যক শোষক গোষ্ঠী। এই সমাজ দাসতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র প্রভৃতির বিবর্তনের মাধ্যমে উপনীত হয়েছে ধনতন্ত্রে।

কার্ল মার্কস দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করে সৃষ্টি করেছেন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছে। এই মতের প্রবক্তাগণ মনে করেন বাস্তব পৃথিবীই সবকিছু, দ্বিতীয়ত বাস্তব পৃথিবীতে যা কিছু ঘটেছে তা ঈশ্বরের নির্দেশে ঘটছে না, তা ঘটেছে বাস্তব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত নিয়মে। তৃতীয়তঃ মানুষের মন বাস্তব সম্পর্ক বিহীন স্বতন্ত্র কোন কিছু নয়, তা বাস্তবেরই সৃষ্টি। চতুর্থতঃ পৃথিবী রহস্যময় হলেও তার সমস্ত রহস্যকে উদঘাটন করা যায়। মার্কস, এঙ্গলেস, লেনিন, ষ্ট্যালিন এবং মাও-সে-তুং প্রভৃতি দার্শনিকেরা জগৎ ও জীবনের স্বরূপ বা প্রকৃতি নির্ণয়ের ব্যাপারে যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের কথা বলেছেন, সেই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি সাহিত্যের মধ্যে নানাভাবে রূপায়িত হয়েছে। এই পদ্ধতীকে বিজ্ঞানীরা প্রত্যক্ষ করেছেন বস্তুর বিকাশ ও বিনাশের অন্তর্নিহিত কারণগুলিকেআলাদা করে তা বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে।

১৮৪৫ সালে 'The Holy Family' এবং ১৮৪৬ সালে 'The German Ideology' গ্রন্থে মার্কস এবং এঙ্গেলস যৌথভাবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। সমাজিক অবিচার, অসাম্য ও শোষণের মূল কারণগুলি যে মানুষের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে অবলম্বন করেই সৃষ্ট, সেই বোধটারই বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁরা এবং বলতে চেয়েছেন, ইতিহাস হল সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও তার বস্তুকেন্দ্রিক পরিস্থিতির সম্পর্কের বিকশিত রূপ।

'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী সমালোচনা কেবলমাত্র 'সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব' নয়, কি করে রচনাটি তৈরি হয়েছে এবং সেগুলিতে শোষিত বঞ্চিত শ্রেণির উল্লেখ রয়েছে কিনা তাও আলোচনা করে। সাহিত্যকর্মকে আরো পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যাখ্যা করাই তার লক্ষ্য।'

দ্বান্দ্বিক সমালোচনার সঙ্গে যাঁরা কিছুমাত্র ও পরিচিত নন তাঁরা হয়তো জানেন না যে তা সর্বহারার প্রতি লেখকের শৈল্পিক কর্মের দায়বদ্ধতা দাবী করে।

মার্কসীয় বস্তুবাদ মানুষের সমাজের একটি বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব এবং সমাজ রূপান্তরিত করার চর্যা। আরো স্থূলভাবে বললে মার্কসবাদের মূল কথা শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে মানুষের মুক্ত হওয়ার সংগ্রাম। মার্কসীয় সমালোচনা এক বৃহত্তর বৌদ্ধিক বিশ্লেষণের অঙ্গ, যা মতাদর্শগুলিকে বুঝতে চেষ্টা করে।

'উৎপাদিকা-শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সমাজ বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে। কেননা উৎপাদনের উপকরণগুলি ঐতিহাসিক ভাবেই মুষ্টিমেয়ের কুক্ষিগত থাকার ফলে উৎপাদন সম্পর্কটি হয়ে উঠে বৈরদ্বান্দ্বিক।'

উৎপাদনে সরাসরি নিযুক্ত অথচ মালিক নয় এমন দুই শ্রেণির মধ্যে শুরু হয় দ্বন্দ্ব, যার অনিবার্য পরিণতি শ্রেণি সংগ্রাম। শোষণহীন, শ্রেণিহীন আদর্শ সাম্যবাদী ব্যবস্থার লক্ষ্যে শ্রমিক শ্রেণিকে সুসংহত ও সংগঠিত করার দায়িত্ব তাই প্রকৃত মার্কসবাদসম্মত।

মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের ভিত্তিতে আছে মার্কসের ইতিহাসতত্ত্ব।যে তত্ত্বে ইতিহাসকে দেখা হয়েছে বস্তুবাদী এবং দ্বন্দ্বমূলক হিসেবে। ফলে তাঁদের সাহিত্য-তত্ত্বও মূলত বস্তুবাদী এবং দ্বান্দ্বিক। এই তত্ত্বের প্রধান বিষয় হচ্ছে সাহিত্যের সঙ্গে শ্রেণির সম্পর্ক কী, বাস্তব কীভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় এবং সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ কীভাবে বিষয়কে রঞ্জিত করে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাই হবে মার্কসীয় রাজনীতির লক্ষ্য। এরপর জনমুখী সামাজিক অগ্রগতির পথ ধরে সমাজতান্ত্রিক স্তর অতিক্রম করে সাম্যবাদী,শ্রেণিহীন, শোষণহীন, উন্নয়ণ অনুকূল সমাজব্যবস্থা কায়েম হলে মানুষের জীবন-যাপন ও জীবন-দর্শনের সর্বতো উন্নতি ঘটবে। তখন সনাতনী ধারনার প্রথাসম্মত প্রতিষ্ঠানিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার আর প্রয়োজন থাকবেনা। সেই অর্থেই মার্কসবাদ তথাকথিত রাষ্ট্রনায়ক শাসনযন্ত্রের অস্তিত্ব বিরোধী। সুতরাং বলা যেতে পারে শ্রেণি সংগ্রামের সূত্র ধরে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, 'Thesis', 'Anti-thesis' এবং 'Synthesis' এর চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হওয়াই শ্রেণিহীন মার্কসীয় সাম্যবাদী সমাজ গঠনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ থেকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে উত্তরণের সন্ধিক্ষণে ইতিহাসের আর্থ-সামাজিক বিচার-বিশ্লেষণই ছিল মার্কসের কালজয়ী গ্রন্থ "Das Capital"(১৯৬৭)-এর উপজীব্য বিষয়। 'Das Capital' এ উল্লেখিত মার্কসীয় অর্থনীতি সামাজিক শোষণ প্রক্রিয়ার এক অতি বাস্তব বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ যা একান্তভাবেই দিন বদলের দলিল।জি

ভি প্লেখানভ(১৯৫৬-১৯১৮) সাহিত্যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কীভাবে কাজ করে সে বিষয়ে অনেক বেশি আলোচনা করেছেন, শ্রেণি ও সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে তাঁর আলোচনা দীর্ঘদিন মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের ভিত্তি ছিল। রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলে প্রয়োজন হয় সংখ্যালঘুর দমনমূলক রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও স্বেচ্ছাচারিতার বা বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটানো। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে পুঁজিপতিরা ক্ষমতায় থাকলে রাষ্ট্র-শক্তি শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হয় এবং সংখ্যালঘু বুর্জোয়া শ্রেণির অবাধ মুনাফা ভোগের পরিধি বিস্তৃত করে।

মনসামঙ্গল কাব্যের লিখিতরূপ ও পরিবেশনগত রূপের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বস্তুবাদী বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলা যায় যে, সুপ্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে ইতিহাস চলে আসছে তা শ্রেণিদ্বন্দ্বের ইতিহাস। মধ্যযুগীয় সাহিত্যধারার অন্তর্গত মঙ্গলকাব্যগুলিতেও বিশেষ শ্রেণির প্রতি অসন্তোষ, ক্ষোভ, জীবনের ব্যাথা-বেদনার অভিমানের কাহিনি অক্ষম আক্রোশে প্রকাশিত হয়েছে। আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন সামাজিক উচ্চবর্ণীয় সামন্তপ্রভু চাঁদের মনসা পূজার স্বীকৃতির মাধ্যমে অত্যাচারী শক্তির পরাজয় ঘটিয়ে সাধারন মানুষ আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। যুগ যুগ ধরে অত্যাচারের জোয়াল বইতে তারা বাধ্য হলেও শোষণের হৃদয় ফাটা যন্ত্রনাকে প্রকাশ করেছে এই সমস্ত মঙ্গলকাব্যগুলিতে।

মনসামঙ্গল কাব্যে মর্ত্যবাসী মানুষ চাঁদ সদাগরের মধ্যে একটা প্রভুত্ব লক্ষ্য করা যায়। সে বণিককূলের প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী গন্যমান্য ব্যক্তি। শিবাশীষ-পুষ্ট ব্যক্তিত্বের অহংকারী ও মহাজ্ঞানের অধিকারী চাঁদ কাউকে পরোয়া করে না। তার মধ্যে একটা ঔদ্ধত্য-মিশ্রিত শ্রেণিচেতনা প্রবলভাবে দেখা গিয়েছিল। অপরদিকে অযোনি-সম্ভূতা দেবী মনসা জন্মলগ্ন থেকেই অবহেলিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং দেবকুলে অপাংক্তেয়, দেবতা হিসাবে স্বর্গ ও মর্ত্যে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য তার মধ্যে শ্রেণিচেতনাবোধ জন্ম নিয়েছিল। ফলে প্রথমেই তিনি মর্ত্যলোকে নিজের প্রভাব ও অস্তিত্ব বিস্তারের তীব্র আশায় চাঁদবেণের সঙ্গে দুষ্ট সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। মর্ত্যের নরের দ্বারা স্বর্গের দেবী মনসার অপমান, শ্রেণিচেতনায় রূপ নিয়েছিল। ফলস্বরূপ দেবী চাঁদকে জব্দ করার জন্য দমন-পীড়ন নীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন।

মনসামঙ্গল কাব্যটি মূলত আবর্তিত হয়েছে চাঁদ সদাগর ও মনসা দেবীর দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে। চাঁদ সদাগর সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শাসকের প্রতিভু। তাই নারীদেবতা অর্থাৎ নিম্নশ্রেণির মনসাকে পূজা অর্থাৎ স্বীকৃতি দেওয়া তার পৌরুষ ও প্রতাপের বিরোধী। দ্বন্দ্বটি প্রকট হয় ধীরে ধীরে। কিন্তু শোষিত বঞ্চিত মনসা তার এই আত্মপ্রতিষ্ঠার দ্বারা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর, তৎকালীন সমাজের নিগৃহীতা, লাঞ্ছিতা ও বঞ্চিতা নারীর প্রতিভু মনসা। দেবী হলেও মনসার আচারণ চলন-বলন সাজ-সজ্জা, রাগ-বিরাগ সমস্তই সম্পুর্ণ মানবিক। তৎকালীন তথাকথিত নিম্ন সমাজ অর্ন্তভূক্ত মানুষের সামাজিক স্বীকৃতি লাভের জন্য করজোড়ে চাঁদ সদাগরের নিকট মনসাদেবীর প্রার্থনা;

‘চান্দর কোপ দেখি পদ্মার ভয় অতিশয়।
যোড় হাতে কহে দেবী করিয়া বিনয়।।
** ** **
মোর তরে কোপ এড় সাধুর কুমার।
মোর তরে ফুল দেও একবার।।’

(বিজয় গুপ্ত, পৃষ্ঠা-২৩৭)

কিন্তু চাঁদ সদাগর শিবের প্রসাদপ্রাপ্ত। এ কারণে সে ব্রাহ্মণ্য সমাজ বর্হিভূত লোক দেবতাকে স্বীকার না করে, ভৎর্সনা করে পূজা প্রত্যাখ্যান করে।

মনসামঙ্গলের অন্যতম আকর্ষণ নারীদেবতার স্বীকৃতি প্রাপ্তির লড়াই। মনসা ও চন্ডী চাঁদ সদাগরকে দিয়ে পূজা আদায়ের মাধ্যমে সে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়ে দেব সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়। মনসার পূজাকে কেন্দ্র করে যে শক্তির লড়াই শুরু হয়েছিল তাতে বোঝা যায় সেসময় বণিক সম্প্রদায় সামাজিক প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। তাই এদেরকে পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারকও বলা যায়। তাছাড়া অনার্য দেবীর অন্তরালে আর্যদের কর্তৃক অনার্যদের সমাজিক স্বীকৃতি বলেও একে দেখা হচ্ছে। মধ্যযুগীয় সামাজিক জীবনের অখন্ড চিত্র এখানে অঙ্কিত।

লোকজীবনের প্রান ও সৃষ্টিধর্মী শক্তির সঙ্গে সর্প-শক্তি একীভূত হয়েছে মনসার মধ্যে। তার আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি লাভের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সামাজিক উচ্চবর্ণের ভাব ও ভাবনার বিরুদ্ধে সামাজিক নিম্নবর্ণের ভাবনার সংগ্রামের কাহিনিই

পুনারাবৃত্ত হয়। নারায়ণ দেবের কাব্যে চাঁদের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট;

'চন্ডির ইঙ্গিত পাইয়া কাটিমু পদ্মারে।'
(নারায়ণ দেব, পৃষ্ঠা-১০২)

বিজয় গুপ্তের কাব্যে এই অংশে চাঁদের হুঙ্কার আরো তীব্র আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে;

'যেই হাতে পূজি আমি শঙ্কর ভবানী।
সেই হাতে পূজা খাইতে চাহু দুষ্ট কানী।।'
(বিজয় গুপ্ত, পৃষ্ঠা-১৪১)

মনসাদেবীর এই দীর্ঘ সময়ের সংগ্রামের পরে স্বীকৃতি লাভ সামাজিক ভাবধারাগত সমন্বয়ের ইঙ্গিতবাহী। সনকা মনসা পূজার ব্যবস্থা করে। চাঁদ মনসাদেবীকে গালি দিয়ে তার পূজার ঘট ভেঙে ফেলে। কারণ সমান্ততান্ত্রিক প্রভুত্বের জন্য সে হীন জাতির পূজার স্বীকৃতি দিতে পারেনা;

'শিব দুর্গার পুত্র আমি সর্ব্ব দেবে জানি।
লঘুজাতি হইয়া আইসে পূজ্যমানি।।
তাহারে পূজিতে মোর মনে নাহি লয়।
ভাঙ্গিব তাহার মাথা কহিলাম নিশ্চয়।।
এত বলি সদাগর ক্রোধ হইল অতি।
ঘট ভাঙ্গিতে সাধু চলে শীঘ্রগতি।।
দন্ত করমড় সাধু হেতাল বাড়ি লোফে।
সাধুর কোপ দেখিয়া পদ্মার প্রান কাপে।।
অন্তরীক্ষ হইলা পদ্মা নাগরথে চড়ি।
হেতাল বাড়ি দিয়া সাধু ঘট করে গুড়ী।।
ভাঙ্গিলেক ঘট সাধু অতি ক্রোধ হইয়া।
সোনেকারে সালি পাড়ে ঘট ভাঙ্গিয়া।।'
(বিজয় গুপ্ত, পৃষ্ঠা-১৪৮)

মনসা তার অস্তিত্বের সংকটে বিপর্যস্ত। সে তার অপমানের কথা পিতা মহাদেবকে জানিয়েছে। প্রত্যুত্তরে মহাদেবের কথা থেকে বোঝা যায় চাঁদ সমাজের প্রতিষ্ঠিত ঐশ্বর্যবাণ ব্যক্তি।তার হাতেই সমাজে মান্যতা দানের ক্ষমতা। তার মান্যতা পেলেই মনসার পূজা মর্ত্যেবাসীর মধ্যে প্রচারিত হবে;

'চান্দ যদি তোমা পূজা করে একচিত।
তবে সে তোমার পূজা হবে পৃথিবীত।।'
(বিজয় গুপ্ত, পৃষ্ঠা-১৫১)

প্রতিবাদে পদ্মাও চাঁদের পূজা প্রাপ্তির জন্য বদ্ধপরিকর;

'একে একে সকল তার কবির নিপাত।
ভয় পাইয়া পূজিবে তোমা জোড় করি হাত।'
(বিজয় গুপ্ত, পৃষ্ঠা-১৫১)

মনসা তার সহযোগীদের এ কাজে সাহায্য করার আহ্বান জানায়। কারণ নিচু জাতি হিসাবে নিজের প্রাপ্য আদায় করতে তাদের লড়াই করে এগিয়ে যেতে হবে। শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সম্মিলিত শক্তিকে প্রয়োগ করে তাকে ধীরে ধীরে শক্তিহীন করতে হবে। তবেই তার কাছ থেকে প্রাপ্য আদায় করা যাবে;

'পদ্মা বলে পুত্রগন কি কহিব তোমাকে।
চান্দর বাড়ী গেলাম আমি পূজা খাইতে।।
ভকতিভাবে সোনা দিল ফুলপানি।
চান্দ মোর ঘট ভাঙ্গে আর বলে কানি।।
চান্দর অপমান আর সহিতে না পারি।
আজু কাটিব জাইয়া চান্দর গুয়া বাড়ী।।
(বিজয় গুপ্ত, পৃষ্ঠা-১৫২)

মনসার নাগদের সঙ্গে চলাফেরার ফলে তাকে নিচু জাতি হিসাবে গন্য করা হয়েছে;

'নাগকন্যা এক জাতি
সঙ্গে নাগ উনকোটী
নন্দন বাড়ী করিল ছার খার।
(বিজয় গুপ্ত, পৃষ্ঠা-১৫৩)

মনসাকে 'লঘু' অর্থাৎ নিচু জাতির বলে উল্লেখ করা হয়েছে;

'নাগলোকের মাতা সে লঘুজাতি কানি।
বিষদৃষ্টে করে সে এতেক সান্ধানি।।
(বিজয় গুপ্ত, পৃষ্ঠা-১৫৫)

চাঁদ মনসার দ্বন্দ্ব কাব্যে প্রকটভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেই দ্বন্দ্বের মধ্যে কাব্যের আখ্যান আবর্তিত হয়েছে;

'লাজ নাই পদ্মার এ মত বোলে বানী।
শিবের ভক্তের হাতে চাহে ফুল পানি।।
স্বামী এ ছাড়িল থাকে দেখি অনাচার।
হেন জনা পূজিবার ইচ্ছা আছে কার।।'
(জগজ্জীবন ঘোষাল, পৃষ্ঠা-১১৫)

সেই দ্বন্দ্বকে মনসা নিজেদের মধ্যে সমাধান করতে চেয়েছিল। কিন্তু চাঁদ তার শাসকের শক্তিবলে সেই যুক্তিকে নস্যাৎ করে মনাসাকে চরম অপমান করে;

'পদ্মা বোলে দাদা কত বাড়াইস দ্বন্দ্ব।
সভার ভিতরে কেনে বোল মন্দ ছন্দ।।
এখন আমাকে দাদা দেহ পুষ্পজল।
ঘরে ঘরে দ্বন্দ্ব বাদ নহিবে কুশল।।
ক্রোধ হইয়া বোলে চান্দ শুন ভাতার ছাড়ি।
যাচিয়া চাহিস নাকি হেমতালের বাড়ি।।'

(জগজ্জীবন ঘোষাল, পৃষ্ঠা-১১৬)

এর পরিপ্রেক্ষিতে মনসা চাঁদের সর্বস্ব ধ্বংস করে ছয় পুত্রের বিনাশ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। অর্থাৎ স্বীকৃতি আদায়ের জন্য সে নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে শাসককে বা সামন্তপ্রভুকে শক্তিহীন করে পূজা অর্থাৎ স্বীকৃতি আদায় করেছে।

সুতরাং বলা যায় মনসামঙ্গলের চাঁদের মানসিকতা প্রভুত্বের। অত্যাচারী প্রভু হিসাবে সামান্যা নাগজাতির দেবী মনসাকে কিছুতেই তিনি স্বীকৃতি দেবেননা। তার মনোভাব উচ্চবর্গীয় সমাজপ্রসূত। মনসা এখানে শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের প্রতিনিধি।সে সংগ্রামের মাধ্যমে নিজ অধিকারটুকু জয় করতে প্রতিস্পর্ধী। তাই এখানে চাঁদ-মনসার দ্বন্দ্বকে বলা যায় শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব, এই দ্বন্দ্বে মনসা পরাজয় বরণ করতে চায় না। তাকে সংগ্রাম করে নিজ ক্ষমতা আদায় করতে হয়। এই ক্ষমতার লড়াইয়ে অসংখ্য ক্ষতি হয়েছে। তবু শোষিতকে সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রাপ্য আদায় করতে হয়। চাঁদের বাঁ হাতে মনসা পূজার স্বীকৃতি তারই প্রতীক।

অর্থনৈতিক কাঠামো যদি হয় ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক তাহলে সমাজ হবে ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক। ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ গড়ে ওঠে সে সম্বন্ধ হল শ্রেণি বৈষম্যমূলক সম্বন্ধ, প্রভু ও ভৃত্যের সম্বন্ধ, শোষক-শোষিতের সম্বন্ধ। কারণ উৎপাদন যন্ত্র ব্যক্তির অধীনে থাকার ফলে এক শ্রেণির মানুষ হয় মালিক এবং জনগণ হয় সর্বহারা। ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক ধনতান্ত্রিক সমাজকে বলা যায় মালিক শ্রেণি কর্তৃক শোষিত শ্রেণিকে শাসন করার যন্ত্র। শোষণকে অব্যাহত রাখার দরুন শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শোষিত ও শোষক শ্রেণির সম্পর্ক মোটেই মধুর নয়। বিশেষতঃ শোষিত শ্রেণি ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার বিরোধী। তারা এই ব্যবস্থার অবসান চায়। সুতরাং এই ব্যবস্থায় শোষিত শ্রেণি মালিক শ্রেণির বিরোধী। শোষিত শ্রেণিকে নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য এবং ব্যক্তিগত মালিকানা টিকিয়ে রাখার জন্য শোষিতের অমর্যাদা করা হয়। সাহিত্য শুধুমাত্র বাস্তবের বা সমাজের অর্থনীতির প্রতিফলন নয়,সেকথা মার্কস এঙ্গেলস বারবার বলেছেন। সাহিত্যের নিজের একটা বিশ্ব আছে, তার উপাদান ভাষার একটা নিজস্ব গতি আছে। মানুষের মন কীভাবে কাজ করে, এইসব বিষয়ে মার্কস যেসব ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন তার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী মার্কসবাদীরা বিভিন্ন তত্ত্ব তৈরি করেছিলেন।দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী সাহিত্যতত্ত্ব তার মধ্যে অন্যতম একটি তত্ত্ব।

অভিজাত শ্রেণির সঙ্গে যখন মেহনতী ভূমিদাস মানুষের সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠলো। যখন মেহনতী মানুষের শ্রমকে আত্মসাৎ করে অভিজাত শ্রেণি সম্পদের ব্যক্তিগত মালিক হয়ে উঠেছিল যারা কোনদিন শ্রম না করে, মেহনতী মানুষকে বঞ্চিত করে বিত্তবান মালিক হয়ে উঠলো, তখন তাদের সঙ্গে মেহনতী মানুষের সম্পর্ক হল শোষক-শোষিতের সম্পর্ক, প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক, অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের সম্পর্ক অর্থাৎ মেহনতী মানুষের চোখে বিত্তবাণ মালিক শ্রেণি হয়ে উঠলো দুষমন, অন্যায়কারী, অত্যাচারী, দুষ্কৃতিকারী।

অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে বলা যায় মনসা শক্তিমান স্বৈরাচারী ও অনাচারী ব্যক্তির কন্যা। কারণ পৌরাণিক মহিমান্বিত দেবতা শিবকে মনসামঙ্গলের কবিগণ কামুক ও আনাচারী করে চিত্রিত করেছেন। চাঁদের সঙ্গে বিবাদে চাঁদকে অন্যায় অত্যাচারে জর্জরিত করে মনসা এখানে স্বৈরাচারী আগ্রাসী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। পদে পদে মনসা তার দৈবশক্তিকে প্রয়োগ করে চাঁদের বিড়ম্বনাকে দীর্ঘায়িত করেছে। চাঁদের মহাজ্ঞান হরণের মধ্যে দিয়ে শাসক শক্তির কৌশলে শোষিতের সমস্ত কিছুকে অর্থাৎ শেষ সম্বলকেও হরণ করার মানসিকতা ফুটে ওঠে। মনসা সামন্ততান্ত্রিক শক্তির অধিকারী শিবের কন্যা। তার কাছেও রয়েছে দৈব শক্তি। সেই শক্তিবলে সে মানুষ চাঁদ সদাগরকে শোষণ করে তার সর্বস্ব হরণ করে তাকে নিঃস্ব করেছে। চাঁদের শেষ সম্বলকেও মনসা শেষ করে দিতে চায়। অনেকক্ষেত্রে বেহুলা মনসার এই অত্যাচারকে মেনে নিয়েছে। কিন্তু স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে সে প্রতিবাদী হয়েছে। নারায়ণ দেবের কাব্যে মনসা লক্ষিন্দরের প্রাণ হরণের বিষয়টি দেব সভায় অস্বীকার করে। তখন মনসাকে দোষরূপ করা হয়;

‘সঙ্করের কন্যা তুমি নাম পদ্যাবতি।
সতেক দোস থাকীতে তোমরা বড় সুতি।।
বড় মনস্যের দোস হইলে দোসান না জায়।
মাস পক্ষ হইলে সকলী লুকায়।।’

(নারায়ণ দেব, পৃষ্ঠা-১৫৫)

সামন্ততান্ত্রিক শাসকের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী মহাদেবের কন্যা হিসেবে মনসার কাছেও রয়েছে দৈব শক্তি। আধুনিক কালে যাকে বিশ্লেষণ করা হয় শাসকের অপরিসীম শোষণ শক্তির সঙ্গে। সেই শক্তিবলে সে মানুষ চাঁদকে চরম বিড়ম্বনা দিয়েছে। নিজের পূজা প্রচারের জন্য এতটা আগ্রাসী মনোভাব ও হিংস্রতা মনসার দেবীত্বকে হীন মানবত্বে নমনীয় করেছে। একে একে চাঁদের সমস্ত শক্তি হরণ করে তাকে নিঃশক্তি করেছে। ছয় পুত্রকে প্রাণনাশ করে, চৌদ্দডিঙ্গা ডুবিয়ে তার আর্থিক ও মানসিক বলকে আঘাত করেছে। শেষসম্বল কনিষ্ট পুত্র লক্ষিন্দরকে বিবাহরাত্রে মেরে একেবারে নিঃস্ব করতে চেয়েছে। তবু চাঁদ অদম্য ব্যাক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছে। মনসা পূজার স্বীকৃতি সে দেবেনা। অবশেষে বেহুলার স্নেহের বন্ধনের কাছে চাঁদকে হার মানিয়েছে। অর্থাৎ পুত্র বধূ বেহুলার আকৃতির কাছে তাকে হার মানতে হয়েছে। এ ভাবেই মনসা নিজের হিংস্রতার মাত্রা ছাড়িয়ে সামন্ততান্ত্রিক আগ্রাসী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু চাঁদকে জীবিত রেখে স্বীকৃতি আদায় করা তার উদ্দেশ্য।

মনসার আগ্রাসনের অন্যতম শক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বেহুলা। তাকে মনসা নিজ কার্যসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছে। বেহুলা প্রথমে সমস্ত সহ্য করেছে। ধীরে ধীরে তার মধ্যেও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। নিজের দুরাবস্থার জন্য মনসাকে দায়ী করেছে। মনসা এখানে দৈবশক্তির বা শাসন বিশেষ শক্তি (Special Power)প্রয়োগের অধিকারী;

'বালী বোলে দেবগণ শুনহ বচন।
মনসা যতেক মোর করিল বিড়ম্বন।।
সত্য না কহে পদ্মা মিথ্যার ঘর।
হেন পাপিষ্ঠাকে জন্ম দিল মহেশ্বর।।'
(জগজ্জীবন ঘোষাল, পৃষ্ঠা-৩০৭)

এখানে বেহুলার প্রতিবাদ যেন শাসক শক্তির বিরুদ্ধে ক্রমাগত শোষণের ফলে বিধ্বস্ত শোষিতের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

নেতা ও পদ্মার যুক্তি পরামর্শ আধুনিক সমাজে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিরূপ। মনসা দেবীর সমস্ত কার্য সম্পাদনের পেছনে রয়েছে তার বোন নেতার বুদ্ধি। সেই বুদ্ধিবলেই মনসা চাঁদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। একে একে সমস্ত কার্য সম্পাদনের পেছনে রয়েছে সুচতুর নেতার চিন্তাধারা। এই চিন্তাধারার প্রভাবেই মনসা নিজ কার্যসিদ্ধি করতে পেরেছে। অর্থাৎ নেতা ও মনসার সম্মিল্লিত চিন্তাভাবনাকে শোষিতের সাংগঠনিক পরিকাঠামো চালানোর প্রকৌশল হিসাবে ধরা যায়;

'নেতো বোলে পদ্যা নিশ্চিন্ত আছ কেনে।
আপনার বুলি তুমি না বুঝ আপনে।।
লোহার ঘর বান্ধি আছো চান্দো সদাগর।
পুত্রবধু থুইয়াছে তাহার ভিতর।।
কালরাত্রি মৈদ্ধে জদি না মরে লখাই।
ইহলোকে লক্ষিন্ধরের আর মির্ত্তু নাই।।
জেনমতে কার্য সিদ্ধি হয় আপনার।
অনুরূপ কার্য্য চিন্তহ প্রকার।।'
(নারায়ণ দেব, পৃষ্ঠা-৭০)

বিজয় গুপ্তের কাব্যে সেই নির্ভরশীলতার চিত্র আরো স্পষ্ট;

'নেতা নেতা বলি পদ্মা ডাকিল বিস্তর।
কি বুদ্ধি করিব নেতা বলহ উত্তর।।'
(বিজয় গুপ্ত, পৃষ্ঠা-২৭৮)

চাঁদের ডিঙ্গাডুবির পর সমস্ত ডিঙ্গা ও জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখার জন্য নেতা মনসা দেবীকে পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ এগুলি না পেলে চাঁদ মনসার পূজার স্বীকৃতি দেবেনা। এখানে নেতার কৌশলী বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে এবং মনসার যোগ্য বুদ্ধিদাতার ভূমিকা পালন করেছে;

'নেতো বলে পদ্মাবতী শোন কহি কথা।
চান্দোর ধন ভাসিয়া গেলে শেষে পাবা কোথা।।
চান্দোর ধনজন যখন চাহে তোমার ঠাই।
তখনে কোথায়ে পাবা বিষহরি আই।।
ধনজন গোছাইয়া থোয় গঙ্গার ঠাই।
তথা থুইয়া চল শীঘ্রগতি যাই।।
সেইখানে রাখিয়াছ চান্দোর ছত্র পো।
সেই খানে ধনজন গছাইয়া থো।।'
(জগজ্জীবন ঘোষাল, পৃষ্ঠা-২৮৮)

লক্ষিন্দর জিয়ান প্রসঙ্গেও মনসা দেবী নেতার বুদ্ধির দ্বারা চালিত। চাঁদকে দিয়ে মর্ত্যে পূজা প্রচার থেকে শুরু করে ধন্বন্তরী হত্যা পর্যন্ত সকল বিষয়েই মনসা দেবী নেতার বুদ্ধির দ্বারা চালিত। নেতা মনসামঙ্গল কাব্যে দক্ষ, কৌশলী এবং সুযোগ্য নেত্রীর ভূমিকা পালন করেছে। সামন্ততান্ত্রিক শাসকের কন্যা মনসার যোগ্য সহযাত্রী নেতা।মনসার সমস্ত শোষণ কার্যে শোষিতকে অর্থাৎ চাঁদকে সর্বস্ব নিঃস্ব করে স্বীকৃতি আদায়ে সাহায্য করেছে নেতা।

মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী সাহিত্য চিন্তা আজ ব্যপ্তি ও গভীরতায় সুদূর প্রসারিত। শিল্প বা সাহিত্যের মূল উপাদান চারটি- শিল্পবস্তু, শিল্পী বা লেখক, জগৎ এবং উপভোক্তা বা পাঠক-দর্শক। মার্কসবাদী ভাবনায় শিল্পে বাস্তববাদকে যথেষ্ঠ গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।মূলত মধ্যযুগীয় মনসামঙ্গলের কবিগণ দেবতার মহিমা প্রচারের জন্যই কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল লৌকিক দেবী মনসার সঙ্গে পৌরাণিক দেবতাদের সম্পর্ক স্থাপন করা। তা করতে গিয়ে দেবতাদের হিংস্র রূপটিকেই এখানে প্রকাশে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চাঁদ সদাগরকেও বেশি অহংকারী করে চিত্রিত করা হয়েছে। সেই দিকটিকে মার্কসীয় সাহিত্য ভাবনার মাধ্যমে প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতির সঙ্গে রাজনৈতিক মতাদর্শের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। তাই সাহিত্যে এর বিশ্লেষণ সম্পর্কে পণ্ডিতগণ দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শের উর্দ্ধে উঠে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার বিশ্লেষণের করার প্রয়াস করা হয়েছে।

<u>গ্রন্থঋণ</u>

১) ঈগলটন টেরী, মার্কসবাদ ও সাহিত্য, দীপায়ণ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর-২০০১
২) চক্রবর্তী সুধীর , বুদ্ধিজীবির নোটবই, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ২০১১
৩) ঘোষ শীতল, মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব, বর্ণালী,কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১১
৪) মন্ডল ইন্দুভূষণ, বাংলা মঙ্গলকাব্যে লৌকিক উপাদান, সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৯
৫) ভট্টাচার্য আশুতোষ , বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ
৬) মুখোপাধ্যায় বিমলকুমার,মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৬
৭) দেব নারায়ণ, পদ্মাপুরাণ, সম্পাদনা, তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪২৮
৮) গুপ্ত বিজয়, পদ্মাপুরাণ, সম্পাদনা, জয়ন্ত কুমার দাসগুপ্ত,কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪২
৯) ঘোষাল জগজ্জীবন, মনসামঙ্গল, সম্পাদনা, শ্রী সুরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬০
১০)বিভূতি তন্ত্র, মনসাপুরাণ, সম্পাদনা, শ্রীআশুতোষ দাস,কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,১৯৮০